CONTAINS EXCLUSIVE BANGLA AND ENGLISH CONTENT

the ULABian

A Student Mouthpiece

msj.ulab.edu.bd/bss/ulabian, স্প্রিং-সামার ২০২৩ | ৬৮৮ বেড়িবাঁধ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্র য়া ণ শ্র দ্ধা ঞ্জ লি

কাজী শাহেদ আহমেদ

জন্ম : ৭ নভেম্বর ১৯৪০, মৃত্যু : ২৮ আগস্ট ২০২৩

ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

ইফাদ হাসান
নাভিদ মুস্তাকীম

জন্মের শুরু কঠিন এক রোগ দিয়ে। বলছি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে জন্ম নেওয়া হাত-পাবিহীন এক নবজাতকের গল্প। বিরল টেট্রা এমিলিয়া সিনড্রোম নিয়ে জন্ম নেওয়া নিক ভুইয়িচিচের বাল্যকালও ছিল বেশ কঠিন। জন্মের পর নিক ভুইয়িচিচের মা ডুশকা ভুইয়িচিচ তাঁর সন্তানকে দেখে মেনে নিতে পারেননি। তিনি একজন নার্স ছিলেন, তাই অসংখ্য নবজাতক প্রসব করানোর সঙ্গে তাঁর সরাসরি সম্পৃক্ততা। তাই নিজ সন্তানকে দেখার পরই তিনি নিকের অসুখ সম্পর্কে ধরে ফেলেন। পাশে থাকা নার্সকে তিনি বলেন, আমার সঙ্গে কেন এমন হলো! ডাক্তাররা যখন নিকের বাবাকে জানান যে তাঁর সন্তান হাত-পাবিহীন জন্মগ্রহণ করেছে, তখন তিনি হতবাক হয়ে যান। বাক্‌রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখতে পান, তিনিও কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। পরবর্তী সময়ে ডাক্তাররা যখন নিককে তার বাবার কাছে নিয়ে যান, তখন তিনি তাকে কোলে নিতে অস্বীকৃতি জানান। জন্মের পর শুরুটাও নিকের জন্য ছিল এ রকম দুঃখের। ভেবে দেখুন, একটি নবজাতক, যার শুরু এতটা কষ্টের, কাউকে জড়িয়ে ধরার জন্য নেই তার কোনো হাত, কারও হাত ধরে এগিয়ে যাওয়ার নেই কোনো উপায়। চাইলেই সে দৌড়াতে পারবে না, হাঁটতে পারবে না। এই নবজাতকের জন্য জীবনের মানে ঠিক কী হতে পারে? বর্তমান জীবনের সঙ্গে অতীতের নেই কোনো মিল।

অবহেলায় একা বড় হতে থাকা সেই ছোট্ট বালকটি আজ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের অনুপ্রেরণা। নিকের জীবনের শুরুটা বেশ অনিশ্চিত হলেও পরবর্তীকালে সে ব্যক্তিজীবনে সফলতা পায়। শৈশব থেকে বর্তমান অবস্থায় আসতে নিককে কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। নিক ছোটবেলায় বেশ হতাশার সম্মুখীন হয়েছে; কারণ, সে স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে পারত না, এমনকি তার সঙ্গে কেউ বন্ধুত্ব করতেও আসত না। কৈশোরে এসেও নিক একাকিত্বে ভুগতে থাকে। জীবনের সেই কঠিন পর্যায়ে নিক কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনাও করে। কিন্তু সেসব ভারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে নিক চলাফেরা করতে পারত না। তাই অসহায় নিককে কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

একপর্যায়ে এসে নিক বুঝতে পারল, তার চেষ্টা করা ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। অসংখ্যবার চেষ্টার পর সে নিজেই দাঁত ব্রাশ করা শিখে ফেলল, চুল আঁচড়ানো শিখে গেল, ইন্টারনেটে ব্রাউজ করা শিখে গেল। এভাবেই সে অনাকাঙ্ক্ষিত সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে শুরু করল। একাকিত্বে ভুগতে থাকা সেই ছোট্ট বালকটি ক্লাস সেভেনে থাকতে ক্লাস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হলো। এভাবে সে সবকিছুতে নিজেকে সংযুক্ত করতে থাকল এবং সাফল্য একটা সময় এসে ধরা দিল তার কাছে। কৃতিত্বের সঙ্গে স্কুলজীবন শেষ করার পর নিক প্রবেশ করল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। কেবল উনিশ বছর বয়সে নিক অর্থনীতি এবং অ্যাকাউন্টিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করল। এরপর নিক অন্যদের স্বপ্ন সফল করার জন্য বিভিন্ন সভা-সেমিনারে তার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প বলতে শুরু করল।

বাস্তবমুখী সেই সব ঘটনায় মানুষ খুব দ্রুত আকৃষ্ট হতে শুরু করল। জীবনের সব আশা হারিয়ে ফেলা অসংখ্য মানুষ নতুন করে জীবন নিয়ে ভাবতে শুরু করল এবং চেষ্টা করতে থাকল সুন্দরভাবে সবকিছু শুরু করার। মানুষের এই ইতিবাচক মনোভাব দেখে নিক আরও উৎসাহ পেল মানুষের সঙ্গে মিশতে এবং তাদের অনুপ্রাণিত করতে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মানুষকে নানাভাবে উৎসাহিত করার জন্য ২০০৫ সালে নিক অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান 'ইয়াং অস্ট্রেলিয়ান অব দ্য ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড পান।

নিকের বর্তমান বয়স ৪০ বছর। অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে জীবনের এই ৪০ বসন্ত পার করলেন তিনি। পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্পৃহা। নিক কখনো থেমে যেতে জানেন না। জীবনের একপর্যায়ে এসে আত্মহননের চেষ্টা করা সেই বালক আজও মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে চলছে। তাই তো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত নিকের এই অবিরাম ছুটে চলা।

ছবি: দ্য ন্যাশনাল নিউজ ডট কম

খবরের ছবি

▶ পৃষ্ঠা ৫ এর পর

পত্রিকা খুললেই দেখা যায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনাভিত্তিক লেখালেখি। অবশ্য এই ধরনের লেখালেখির একটি নামও রয়েছে। সেটি হলো ফিচার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ফিচার আসলে কী? কীভাবে লেখা হয় কিংবা এর গুরুত্ব কী? এসব বিষয় জানতে ইউল্যাবের মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের শিক্ষানবিশ মঞ্চ দ্য ইউল্যাবিয়ান দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে। ৪ এবং ১১ আগস্ট ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত ন্যারেটিভ ফিচার রাইটিং বিষয়ক এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা পরিচালনা করেন প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক জাহীদ রেজা নূর। তিনি কীভাবে আকর্ষণীয় এবং চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গল্প তৈরি করতে হয়, কীভাবে ফিচার গল্প লিখতে হয়– এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তা ছাড়া প্রতিটি বিষয় বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের বাংলার প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহিত করেন তিনি।

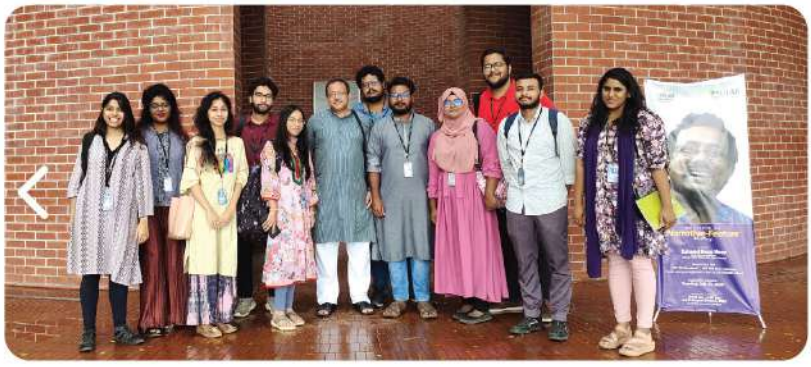

পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের জানাতে পারেন নির্দ্বিধায়। কিংবা আপনিও হয়ে উঠতে পারেন 'দ্য ইউল্যাবিয়ান' পরিবারের একজন। এমনটি ভেবে থাকলে আপনার লেখা পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়:

theulabian@ulab.edu.bd

দ্য ইউল্যাবিয়ান দল: প্রধান উপদেষ্টা: প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো, পিএইচডি, **উপদেষ্টা সম্পাদক:** বিকাশ সিএইচ ভৌমিক, **উপ-সম্পাদকীয় সমন্বয়ক:** নিশাত তাসনিম জেসিকা
সহযোগী দল: মাহযাবীন ইউসুফ, মো রাশেদ, রুহামা আন নাবা, আদনান বিন হান্নান, রাহাত সরকার অর্জন, আকাশ কর্মকার, আবরার ফারহান জামান, মন্দ্রিলা ম. হুদা
কৃতজ্ঞতা: মোঃ রায়হান কবির শুভ্র , **নকশা ও অলংকরণ:** 'দ্য ইউল্যাবিয়ান ডিজাইনিং টিম'

পাখির ভাষায় ভাবপ্রকাশ

কানিজা রহমান

পৃথিবীতে জাতিসংঘ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ১৯৫টি দেশে বর্তমানে প্রায় ৮০০ কোটির বেশি মানুষের বসবাস। বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত এই বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রায় ৭ হাজারের বেশি ভিন্ন ভাষায় কথা বলে। কিন্তু এসব ভাষার মধ্যে একটি ভাষা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে; কারণ, এ ভাষায় তথাকথিত কোনো শব্দ নেই। শব্দ বলতে আমরা দুই ধরনের বিষয় বুঝি। একটি হলো ভাষাগত শব্দ, অন্যটি পরিবেশগত শব্দ। আজ পৃথিবীর এমনই এক ভাষা সম্পর্কে জানব, যার বর্ণমালা বা ভাষাগত কোনো শব্দ নেই।

শব্দহীন এই ভাষার নাম 'কুস দিলি', যা পাখির ভাষা নামেও পরিচিত। উত্তর তুরস্কের পাহাড়ে অবস্থিত কুস্কোয় নামের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের কিছু বাসিন্দা এই বিশেষ ভাষায় কথা বলে। দুর্গম পাহাড়ে বসবাসরত মানুষ পাখির মতো শিস বাজিয়ে অনেক দূরত্বে যোগাযোগ করতে পারে। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে শুধু শব্দ প্রয়োজন, তা ভুল প্রমাণ করেছে এ গ্রামের মানুষ।

কুস্কোয় গ্রামের কৃষকেরা চা, ভুট্টা, বিটসহ বিভিন্ন ফসল এবং গবাদিপশু পালন করে আসছে শত বছরের বেশি সময় ধরে। তারা মূলত পাখির ভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল, যাতে তারা কাজ করার সময় পাহাড়ের ওপরে একে অপরের সঙ্গে দ্রুততম সময়ে যোগাযোগ করতে পারে। মৌলিক চাহিদাগুলো নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এই ভাষা ব্যবহার করা হয়। কারণ, পাহাড়ি এলাকায় একটি সাধারণ ভাষায় চিৎকার করে বাক্য বিনিময় করা সত্যিই অসম্ভব ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে শিস বাজিয়ে কথার আদান-প্রদান করা কুস্কোয় গ্রামবাসীর কাছে সহজ এবং সেটি আরও দূরত্বে পৌঁছে যেতে পারে।

২০১৭ সালে, ইউনেসকোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় 'কুস দিলি' নামক যোগাযোগের এই ভাষা দুর্লভ ভাষা হিসেবে স্থান পায়। ইউনেসকো একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, মোবাইল ফোনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এর বেঁচে থাকার জন্য প্রধান একটি হুমকি। কিন্তু প্রযুক্তি যখন ভাষার বিলুপ্তিতে অবদান রাখছে, তখন কেউ কেউ এটিকে সংরক্ষণ করতেও ব্যবহার করছে। 'Islık Dili Sözlüğü' বা হুইসেল ভাষার অভিধান নামে একটি মোবাইল অ্যাপ বের হয়েছে, যেখানে একটি শব্দের ওপর চাপ দিলে সেই শব্দের অনুবাদ বাঁশিতে শুনতে পাওয়া যাবে। ভাষা সংরক্ষণের এই প্রচেষ্টা এটিকে আরও বৃহত্তর জনমানুষের কাছে সহজলভ্য করে তুলতে সাহায্য করবে। যখন অ্যাপটি প্রকাশ করা হয়, তখন এটি তুরস্কের মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া পায় এবং এর নির্মাতাকে জাতীয় টেলিভিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

কুস্কোয় গ্রামের এক নারী, দুই ঠোঁটের ফাঁকে দুই হাতের আঙুল গুঁজে পাখির ভাষায় করছেন মনের ভাবের প্রকাশ। ছবি: গ্রেট বিগ স্টোরি ইউটিউব চ্যানেল

শীতে বরফের চাদরে ঢাকা পড়ে সাইবেরিয়ার ইয়াকুতিয়া গ্রাম। এমনকি ঘর থেকে কেউ বের হলে তুষারের প্রলেপে খুব কাছের মানুষটির চেহারাও যেন চেনা দুষ্কর হয়ে পরে। ছবি: ইউএসএ টুডে

পৃথিবীর শীতলতম গ্রামে মানুষ গোসল করে কীভাবে?

ইবসান জামান দিপ্ত

গোসল নিত্যদিনের একটি জরুরি অভ্যাস। যা আপনার শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, প্রশান্তি এনে দেয়। বাংলাদেশের মতো আর্দ্র আবহাওয়ার দেশে যদি প্রতিদিন গোসল না করেন, তাহলে শরীরের দূষিত পদার্থগুলো আপনাকে অসুস্থ করে ফেলতে পারে। কিন্তু শীতকালে আমাদের সবারই গোসলের প্রতি অনীহা তৈরি হয়। তার ওপর তাপমাত্রা যদি হয় মাইনাসে, তাহলে তো গোসল করার প্রশ্নই ওঠে না। তেমনি সাইবেরিয়া অঞ্চলে গোসল করা যেন একটি অসাধ্য ব্যাপার। ওখানে যদি আপনি পানি ফুটিয়েও নেন, তবু তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেতে যেতে জমে যাবে। তাই সাইবেরিয়ার মানুষ একটু ভিন্নভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের এই অভ্যাস অব্যাহত রাখে।

রাশিয়ার বিস্তীর্ণ বরফে ঢাকা একটি পাহাড়ি অঞ্চলের নাম হলো সাইবেরিয়া। এখানকার জীববৈচিত্র্য যেমন বিচিত্র, তেমন এখানকার মানুষের অভ্যাসও বড় বৈচিত্র্যময়। এই সাইবেরিয়ার একটি গ্রাম হলো ইয়াকুতিয়া, যা পৃথিবীর শীতলতম গ্রামগুলোর একটি। এখানে তাপমাত্রা মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মাইনাস ৭২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যায়। যেকোনো পদার্থ এখানে নিমেষে জমে যেতে পারে। এমন বৈরী আবহাওয়ায় পরিষ্কার পানির জন্য এই গ্রামের মানুষ নদী থেকে চার কোনা বরফ কেটে আনে এবং বাসস্থান গরম রাখার জন্য গ্রীষ্মকালেই জ্বালানি হিসেবে কাঠ জোগাড় করে রাখে। তবে এখানকার মানুষ আর দশটা দেশের মানুষের মতো স্বাভাবিক নিয়মে গোসল করে না। এখানে গোসল করার নিয়মকে স্টিম বাথ বলা হয়। রাশিয়ায় এটিকে সাওনা বলা হয়। যদিও এ দুটির প্রায়োগিক কিছু ভিন্নতা রয়েছে।

একটি সিলিন্ডার আকৃতির লোহার পাত্রে নদীর কিছুটা পরিষ্কার পানি এবং বরফ ভর্তি করে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ফোটানো হয়। এতে যে বাষ্প তৈরি হয়, তা একটি পাইপের সাহায্যে বদ্ধ ঘরে নিঃসরণ করা হয়। ২০ থেকে ৩০ মিনিট তারা সেই ঘরে বসে থাকে। বসন্ত রোগাক্রান্ত রোগীর গায়ে যেভাবে নিমপাতা বোলানো হয়, তেমনি ওক গাছের পাতা দিয়ে তারা শরীরের দূষিত পদার্থ এবং জীবাণু পরিষ্কার করে। প্রতিবার স্টিম বাথের জন্য বিপুল পরিমাণ জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন হয়। এ জন্য ইয়াকুতিয়া গ্রামের মানুষ শীতকালে সপ্তাহে একবার স্টিম বাথ নেয়। স্টিম বাথ বা সাওনা রাশিয়ানদের একটি ঐতিহ্য। এমনকি গবেষকেরাও বলেন, স্বাভাবিক গোসলের থেকে স্টিম বাথ মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এবং মস্তিষ্ক শিথিল করে। অনেক সময় ইয়াকুতিয়ার মানুষ যারা ঠান্ডা সহ্য করতে পারে, তারা নদীর ওপরের বরফের স্তর কেটে নিচের ঠান্ডা বরফ জলে ডুব দিয়ে গোসল করে, যা আমাদের মতো স্বাভাবিক মানুষের জন্য একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। একে বলা হয় আইস বাথ। এভাবেই ইয়াকুতিয়া গ্রামের মানুষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করছে এবং এমন বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও তারা খুব স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

মেরাজ আহমেদ

'ধর্মের চর্চা চাইলে মন্দিরের বাইরেও করা চলে। দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা জাদুঘরে'– প্রমথ চৌধুরীর এই কথাগুলো পড়লে প্রথমে মাথায় আসে, তাহলে মুক্তচিন্তার বিকাশ কোথায়?

নিশ্চিতই কোনো মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে! তাহলে সুস্থ শিক্ষার মুক্ত শিক্ষাঙ্গন হিসেবে 'ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ'কে নির্বাচন করাটা মোটেও বাড়াবাড়ি কিছু নয়।

অনলাইনে অ্যাডভারটাইজের মতো হঠাৎ একদিন 'ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ'-এর একটা বিজ্ঞাপন সামনে আসে। বিজ্ঞাপনের ছবি আমাকে ভর্তির জন্য যত আকৃষ্ট করেছিল, তা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে সামনাসামনি দেখার পর। যখন দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পছন্দের 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য' বিভাগ রয়েছে, তখন ইউল্যাবের প্রতি ভালো লাগা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। ইউল্যাব সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে একগুচ্ছ ইতিবাচক মন্তব্য পেয়ে আর দ্বিতীয় কোনো ধরনের চিন্তা মাথায় আসতে দিইনি। একপ্রকার আনন্দিত হয়ে ফরম উঠিয়ে ভাইভা পরীক্ষায় সাক্ষাৎ করি ইউল্যাবের কয়েকজন বিশিষ্ট, সৌম্যকান্তি শিক্ষকের সঙ্গে। তাঁদের আচরণ আমাকে এতটাই মুগ্ধ করে এবং এখানে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে যে, আমি ভর্তি হওয়ার সব পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

ইউল্যাব পরিবারের সদস্য হওয়ার পরের দিনগুলো আরও বেশি সুন্দর এবং আনন্দের। ইউল্যাবের শিক্ষার্থীরা যেমন প্রতিভাবান, তেমনি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটিও একটি স্বমহিমান্বিত আর্ট! দূষণ আর যন্ত্রের হাহাকারে অতিষ্ঠ রাজধানীতে বিশাল একটা মনোমুগ্ধকর ক্যাম্পাস। বড় খেলার মাঠ, ঔষধি বাগান, মিনি লেক, আর একটা বড় লাল দুর্গ– যেন শান্তিনিকেতন আর শতবর্ষী রমনার ছাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ইঞ্চিতে লেগে আছে। যদি সবার কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউল্যাব ক্যাম্পাসকে মন ভালো করার 'বৃন্দাবন' বলা যায়, তাহলে আমার মনে হয়, এই ক্যাম্পাস হতাশা ও মনের সংকীর্ণতার মতো নেতিবাচক মনোভাবের জন্য কারবালাস্বরূপ।

আপনারা ঠিক ধরেছেন, আমি ইউল্যাবের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রথম ব্যাচের একজন গর্বিত শিক্ষার্থী। নোবেল বিজয়ী মেক্সিকান সাহিত্যিক অক্টাভিও পাজের তত্ত্ব অনুযায়ী বিনা কোনো স্বার্থে আমি আমার মাতৃভাষা বাংলার জন্য কিঞ্চিৎ কিছু করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি। আমি এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছি ইউল্যাবের-এর মাধ্যমে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমার এগিয়ে চলার পথে বজ্রের মতো অনড় শুভাকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষী অভিভাবক হয়ে পাশে আছেন আমার বিভাগের প্রতিভাবান ও জ্ঞানপিয়াসি শিক্ষকগণ। যখন দেখি এই বিশ্বায়নের যুগেও আমাদের বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শামীম রেজা, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক শারমিনুর নাহার, প্রভাষক সৈয়দা রেশমা আক্তার লাবনী, প্রভাষক সাদিয়া আফরিন, প্রভাষক শিরীন আক্তার-এর মতো আধুনিক মানুষেরাও আমাদের মাতৃভাষাকে লালন-প্রসার-প্রচারের মতো মহৎ কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন, তখন আমি এবং আমার বিভাগের শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হই। তাঁদের জীবনাদর্শ দেখলে মনে হয়, শুধু নিজেদের স্বার্থই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, দেশ ও জাতির প্রতিও আমাদের অনুগত থাকা একান্ত কর্তব্য।

আর এই দেশ ও জাতির প্রতি আমার এবং আমাদের সবার যে ঋণ রয়েছে, সেই ঋণের তাড়নাই আজ আমাদের বিভাগের শিক্ষার্থীদের বাঙালি জাতির মাতৃভাষার পাঠ অধ্যয়নে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

আমাদের সিলেবাস যতটা বিস্তৃত, ঠিক ততটাই সমৃদ্ধ। বাঙালি ভাষা-সংস্কৃতি, বাংলার ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের ভাষা-সংস্কৃতি, অনুবাদ সাহিত্য, তুলনামূলক সাহিত্য, বিশ্ব সাহিত্য, ভাষাবিজ্ঞান, গবেষণা রীতি, সৃজনকর্ম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-কোর্স আমাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত, যা বাংলাদেশের অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাছে ঈর্ষণীয়।

আশা করি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিভাগের মতো আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগকেও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবে এবং আমাদের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করবে।

অবশেষে আমার প্রিয় ইউল্যাবের সব শিক্ষার্থীর উদ্দেশে বলতে চাই, আসুন, সবাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলার বিশুদ্ধ চর্চা শুরু করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে থাকা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোর্সসমূহ গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন করি, নিজেদের মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসি এবং যারা বাংলা ভাষা সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত, সার্বিকভাবে তাঁদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই।

খবরের ছবি

নিশাত তাসনিম জেসিকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ শুধু জ্ঞানের সৃষ্টিই নয়, সৃষ্ট জ্ঞান বিতরণও এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। শিক্ষার এ পর্যায়ে জ্ঞান বিতরণ বা অর্জনের খুব জনপ্রিয় একটি ব্যবস্থা হলো আন্তর্জাতিক শিক্ষাবিষয়ক বিনিময় কর্মসূচি। ঠিক এমন একটি কর্মসূচির অধীনে ইউল্যাবের এমবিএ ও ইএমবিএ'র নয়জন শিক্ষার্থী ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম), শিলং, আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক শিক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। জুলাই ২ থেকে ৭, ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আগত পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের কাছ থেকে ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক, এ সম্পর্কিত সমস্যা, সমাধানের উপায় এবং কর্মজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ভিআর বা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি জানি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এআই এবং ভিআর প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনই-বা কী রয়েছে? কীভাবে এই দুটি বিষয় ভবিষ্যতে বড় এক পরিবর্তন সৃষ্টি করছে? ঠিক এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানানোর জন্য ইউল্যাবের ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগ ৫ জুলাই ২০২৩ তারিখে 'এআর/ভিআর এবং মেটাভার্স' বিষয়ে একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সেশনের আয়োজন করে। ড. জোসেফ জেরোম (এআর/ভিআর নীতি বিশেষজ্ঞ) এবং ড. সোহানা নাসরিন (শিক্ষক, ইউল্যাব) এই আলোচনায় নেতৃত্ব দেন। ড. জেরোম মেটাভার্সের বিস্তৃত ধারণা প্রদান করেন, পাশাপাশি অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর) বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেন এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োগের ওপর জোর দিয়ে তাদের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় ব্যবসায়িক বিনিয়োগ, বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর জন্য উদ্ভাবনী গল্প, এআইয়ের উত্থান, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর তাৎপর্য অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আচ্ছা, বলুন তো? কেউ যদি আপনার ব্যক্তিগত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে ব্যক্তিগত তথ্য এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা আপনার কষ্টার্জিত জমানো টাকা মুহূর্তে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে নেয়, তখন আপনি কী করবেন? কিন্তু তার আগে আরেকটি প্রশ্ন রয়েছে, সেটি হলো তারা কীভাবে এই চুরি বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেল? অবশ্যই আপনার নিরাপত্তায় ত্রুটি ছিল। নিরাপত্তা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সবকিছু যখন অনলাইনকেন্দ্রিক, তখন ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়েও ভাবতে হয়। ২০০৬ সালে প্রথমবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন প্রণয়ন করা হয়। ইউল্যাবের ডিপার্টমেন্ট অব কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে 'ডিজিটাল রাইটস অ্যান্ড সেফটি' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে। প্রধান বক্তা ছিলেন জনাব শাহনেওয়াজ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী। তিনি অনলাইন নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সিএসইর শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮-এর তাৎপর্য তুলে ধরেন।

জ্ঞানার্জনের জন্য বই ও ভ্রমণের বিকল্প নেই। তেমনি এক শিক্ষাসফরের আয়োজন করেছিল ইউল্যাবের ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স (ইইই) বিভাগ। গত ২৭ জুলাই ২০২৩-এ তারিখে ইজিসিবি'র (ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড) সহযোগিতায় হরিপুর ৪১২ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টে একটি সফল শিল্প পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সফরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করে এবং কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্টের চারপাশে একটি নির্দেশিত সফর করার পাশাপাশি এর অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়ক সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে।

> বাকি অংশ **পৃষ্ঠা ২, কলাম ১**

বঙ্গজননী কিংবদন্তি

বেগম সুফিয়া কামাল

জাকিয়া সুলতানা সানাম

আজ একটা গল্প বলব, বাংলার অসুরপুরের নানা ধরনের দৈত্যের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামমুখর বন্দিনী রাজকন্যার লড়াইয়ের গল্প। তিনি ছিলেন মমতাময়ী, স্নেহময়ী, বঙ্গজননী এবং বাংলার এক আদর্শ নারী। ছিলেন প্রত্যেক পরিপূর্ণ বাঙালির মা, নারী জাগরণের অগ্রদূত, বহুমাত্রিক প্রতিভাময়ী মহীয়সী নারী, কালজয়ী কবি বেগম সুফিয়া কামাল। বাংলার বীর সন্তানদের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন এই বঙ্গজননী তাঁর সাহসিকতা দিয়ে। 'মোর যাদুদের সমাধি' কাব্যগ্রন্থে কবি সুফিয়া কামাল লিখেছেন–

'কে আছে সৌভাগ্যবতী আমার মতন
এক পুত্রহীনা হয়ে শত পুত্র ধন
লভেছি, সৌভাগ্য মোর। শতেক দুহিতা
সারা বাংলাদেশ হতে ডাকে মোরে মাতা
জননী আমার! তুমি করিয়ো না শোক
তুমি আছ পূর্ণ করি সর্বান্তর লোক।'

ভারতীয় উপমহাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কিংবদন্তি সুফিয়া কামালের জন্ম এমন এক সময়ে (১৯১১ সালের ২০ জুন), যখন যুদ্ধের দামামা বেজে চলছিল গোটা বিশ্বে। বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে সেই সময়টাতে দুনিয়াজুড়ে নতুন নতুন ধারার প্রবর্তন হচ্ছিল। দেশীয় সাহিত্যে দাপিয়ে বেড়ানো রবীন্দ্রনাথের নোবেল বিজয়ের মাত্র দুই বছর আগে বরিশালের শায়েস্তাবাদে অভিজাত এক জমিদার পরিবারে মাতামহের বাড়িতে জন্ম হয় সুফিয়া কামালের। তিনি একজন প্রখ্যাত কবি, চিন্তাবিদ, সমাজকর্মী, লেখক, নারীবাদী এবং বাংলাদেশের সমসাময়িক নারী উন্নয়ন আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁর পিতা সৈয়দ আব্দুল বারী সুফিয়ার সাত বছর চলা অবস্থায় সাধকদের অনুসরণে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হন। বাবার অনুপস্থিতিতে তখন তাঁর মা সাবেরা খাতুন সুফিয়ার নানাবাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। ফলে মায়ের স্নেহ-মমতায় তাঁর শৈশব কেটেছিল সেখানেই। তখনকার বাঙালি মুসলিম নারীদের থাকতে হতো গৃহবন্দি। না ছিল নারীশিক্ষার গুরুত্ব, না ছিল বিদ্যালয় পাঠের সুযোগ। এমনকি, বাংলা ভাষার প্রয়োগও পরিবারে নিষিদ্ধ ছিল; কারণ, সেখানে কথ্য ভাষা ছিল উর্দু এবং মেয়েদের পর্দা করা ছিল বাঞ্ছনীয়। ফলে আরবি ও ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও বাংলা শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই বাড়িতে বসেই তিনি বাংলা শিখতেন তাঁর মা ও মামার কাছে। মায়ের উৎসাহ ও সহযোগিতায় তিনি বই পড়ার সুযোগ পান মামার লাইব্রেরিতে। কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পাওয়া সত্ত্বেও একটি রক্ষণশীল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে বসবাস করেন, পারিবারিক উত্থান-পতনের মধ্যেও তিনি নিজ প্রচেষ্টায় স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। পর্দার ঘের থেকে বেরিয়ে আসেন এক আধুনিক নারী হিসেবে। সে সময়ে সুফিয়া কামালের মতো একজন স্বশিক্ষিত এবং সমাজসচেতন নারীর আবির্ভাব ছিল অসামান্য ব্যাপার। এই দেশ, দেশের মানুষ, সমাজ, ভাষা ও সংস্কৃতি তাঁকে স্বশিক্ষিত হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

স্বামী সৈয়দ নেহাল হোসেনের সহযোগিতায় সমাজসেবা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহিত হয়ে সুফিয়া কামাল সে সময়ের বাঙালি সাহিত্যিকদের রচিত লেখা পড়তে শুরু করেন, পাশাপাশি নিজেও লিখতে শুরু করেন। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত সে সময়ের প্রভাবশালী সাময়িকী সওগাত পত্রিকায় 'বাসন্তী' নামক সুফিয়ার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সাঁঝের মায়া' কাব্যগ্রন্থটি। এর ভূমিকা লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটি পড়ে সুফিয়ার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সেই থেকে সুফিয়া কামাল কবি মহলে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় কবি সুফিয়া কামাল দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৮ সালে সুফিয়া কামাল ব্যাপকভাবে সমাজসেবা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সুফিয়া কামাল সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর দমননীতির অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তিনি 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন' পরিচালনা করেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনে ঢাকায় নারী সমাবেশ ও মিছিলে তিনি নেতৃত্ব দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ধানমন্ডির নিজ বাড়িতে অবস্থান করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর দান প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তিনি তাঁর মুক্তিসংগ্রামী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যুদ্ধকালীন তিনি 'একাত্তরের ডায়েরী' নামে একটি দিনলিপি রচনা করেন এবং এ সময়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলো পরবর্তীকালে 'মোর যাদুদের সমাধি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলোতে তিনি বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতার বর্ণনা দেন এবং দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে নারী জাগরণ আর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে গেছেন। ১৯৯০ সালে তিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, কারফিউ উপেক্ষা করে নীরব শোভাযাত্রা বের করেছেন। মুক্তবুদ্ধির পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে আমৃত্যু তিনি সংগ্রাম করে গেছেন।

কবি সুফিয়া কামাল, বুদ্ধিজীবী, সমাজনেত্রী এবং অনন্যসাধারণ নারী ব্যক্তিত্ব। দেশে নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী নারী কবি সুফিয়া কামাল আজীবন মুক্তবুদ্ধির চর্চার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি নারী সমাজকে কুসংস্কার আর অবরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। নারীদের সংগঠিত করে মানবতা, অসাম্প্রদায়িকতা, দেশাত্মবোধ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। দেশের যেকোনো মানবতাবাদী, প্রগতিবাদী ও গণমুখী কর্মসূচিতে তিনি সবসময় অগ্রভাগে ছিলেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রামসহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তাঁকে জনগণের 'জননী সাহসিকা' উপাধিতে অভিষিক্ত করেছে। তাঁর স্মরণে বাংলাদেশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য 'বেগম সুফিয়া কামাল হল' নির্মাণ করে। বাংলার প্রতিটি সংগ্রামে সুফিয়া কামালের যেমন ছিল দৃপ্ত পদচারণ, তেমনি তিনি ধারণ করেছেন বাঙালি আধুনিক নারীর প্রতিকৃতি।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন কবিতা চর্চা ও লেখালেখির মধ্য দিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ কামনা করেছিলেন কবি সুফিয়া কামাল। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার পর তিনি এ দেশের নারী সমাজকে অন্ধকার পথ থেকে সরিয়ে শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও আলোকিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁকে বেগম রোকেয়ার উত্তরসূরি হিসেবেও অনেকে মনে করেন। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে কবি সুফিয়া কামালের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সফল নেতৃত্বে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে রাজপথে এ দেশের নারী সমাজ নেমে এসেছিল। বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কাজ করার আগ্রহী করে তুলতে সহযোগিতা করেছিল কবি সুফিয়া কামালের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম, কবিতা এবং তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনার রাজনীতি।

১৯৯৯ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় আজিমপুর কবরস্থানে। বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

আদর্শের মৃত্যু হয় না, মৃত্যু হয় না প্রতীকের। তাই মৃত্যু নেই সুফিয়া কামালেরও। কারণ, তিনি ছিলেন আদর্শের প্রতীক। জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি তিনি ছিলেন আপোসহীন, জ্যোতির্ময় বিবেকের প্রতীক, চেতনার প্রতীক। কবির ভাষায়–

'তুমি বেঁচে রবে আমার ভুবনে যতদিন আমি রব,
যুগ যুগ ধরি প্রতিদিন আমি তোমারে ঘেরিয়া নব।'

বেগম সুফিয়া কামাল
ছবি: ইন্টারনেট

ইউল্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনে কাজী শাহেদ আহমেদ

ছবি: ইউল্যাব কমিউনিকেশনস

ইউল্যাবের প্রতিষ্ঠাতা

কাজী শাহেদ আহমেদের জীবনাবসানে শ্রদ্ধাঞ্জলি

দ্য ইউল্যাবিয়ান নিবেদন

জীবনের এক সময়ে এসে মানুষকে থেমে যেতেই হয়! 'জন্মিলে মরিতে হইবে'– এমন অনিবার্য সত্য এড়িয়ে যাওয়ার উপায় যেহেতু নেই, সেহেতু সময় এলেই তাকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতেই হয়। সেটা হতে পারে আজ অথবা কাল, যেতে তো হবেই। স্রষ্টার এ কঠিন এবং অপরিবর্তনীয় নিয়মেই ছেড়ে যেতে হলো আমাদের প্রিয় মানুষ কাজী শাহেদ আহমেদকে। ২৮ আগস্ট ২০২৩ (সোমবার) ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিছু মানুষ থাকেন, যাঁদের অতুলনীয় অর্জনের ওপর দৃষ্টিপাত করতে গেলে শব্দভাণ্ডার যেন ফুরিয়ে যায়। কাজী শাহেদ আহমেদ ছিলেন তেমনই এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। গ্রিক পুরাণে বর্ণিত রাজা মাইডাসের মতো তিনি যেখানেই হাত দিয়েছেন, সেখানেই সোনা ফলিয়েছেন। তাঁর অসংখ্য পরিচয়ের মধ্য থেকে যেকোনো একটিই সম্যক বিবেচনায় সফল হিসেবে গণ্য করার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠাকালীন প্লাটুন কমান্ডার এবং একাধারে ১৪ বছর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিরলস শ্রম দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, লেখক, ক্রীড়া সংগঠক, একজন প্রকৌশলী।

সমাজে যে গুটিকয় মানুষ সম্ভাবনার আলো দেখতে সমর্থ, কাজী শাহেদ আহমেদ ছিলেন তেমনই একজন দূরদর্শী– অভিনব সব উদ্যোগ ও পরিকল্পনা দিয়ে চমকে দিয়েছেন সবাইকে। যা-ই করেছেন, তাতে ছিল নতুনত্বের স্পর্শ। ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'জেমকন গ্রুপ'। সেখান থেকেই শুরু ব্যবসায় জীবনের। অর্গানিক খাবার যে বর্তমানে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে, তার পেছনে রয়েছে এই মানুষটির সুপরিকল্পিত অবদান। দেশে প্রথম অর্গানিক চায়ের বাগান তিনিই প্রবর্তন করেন এ দেশে আধুনিক সাংবাদিকতার সূচনাও মূলত তাঁর হাত ধরে ঘটেছে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র হলো 'আজকের কাগজ'। যাত্রাকালীন সময়ে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ কাগজ ছিল প্রতিবাদের এক বলিষ্ঠ স্বর। কাজী শাহেদ আহমেদ ছিলেন এই পাঠকপ্রিয় পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। এবং কোনোভাবেই তিনি এ কাগজকে ক্ষমতাসীনদের হাতের পুতুলে পরিণত হতে দেননি। গণতন্ত্রের সেই ঘোর অন্ধকার সময়ে, এ রকম একটি বস্তুনিষ্ঠ খবরের কাগজ প্রকাশ করা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসিক ছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু হাজারো প্রতিকূলতা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রোষানলের মুখেও তিনি কখনো আদর্শের সঙ্গে, সততার সঙ্গে আপস করেননি। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি আজকের কাগজ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আজকের কাগজ ছিল মূলত একটা আন্দোলন, একটা বিপ্লব। আজকের কাগজের দর্শন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। আর লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুজ্জীবিত করা।'

কাজী শাহেদ আহমেদ মূলত ছিলেন একজন স্বাপ্নিক মানুষ। স্বপ্ন ছড়িয়ে দিতে এবং দক্ষ ও সৎ মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)', যা বর্তমানে দেশের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া তিনি আবাহনী লিমিটেডের ডিরেক্টর ইনচার্জ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন অনেকটা সময়।

শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি শাহেদ আহমেদের ভালোবাসা ছিল অগাধ। তাই কর্মব্যস্ত জীবনে সাহিত্য জগতেও এঁকেছেন অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। ২০১৩ সালে ৭৩ বছর বয়সে তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ভৈরব'। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'আমার লেখা' প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। সে বছরই 'ঘরে আগুন লেগেছে' নামে তাঁর দ্বিতীয় বই প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনী 'জীবনের শিলালিপি' প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে। একই বছর প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'পাশা'। ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'দাঁতে কাটা পেনসিল'। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'অপেক্ষা'। ভাষার নির্মল সাবলীলতা, জমজমাট বর্ণনা ও সূক্ষ্ম রসবোধে পরিপূর্ণ ছিল তাঁর কথাসাহিত্য, ফলে যথেষ্ট পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে তাঁর বইগুলো। এ ছাড়া তাঁর রচিত উপন্যাস 'ভৈরব' ইংরেজি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

পেশাগত দিক ছাড়াও পারিবারিক দিক দিয়ে তিনি একজন সফল মানুষ। স্ত্রী আমিনা আহমেদ বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। তিন পুত্রসন্তানকেও তাঁরা গড়ে তুলেছেন আদর্শ মানুষ হিসেবে।

কাজী শাহেদ আহমেদকে নিয়ে পর্যালোচনা করতে গেলে মনে হয়, তাঁর জীবন যেন ছিল সৌকর্যমণ্ডিত এক সুবিশাল অট্টালিকা, যার যেকোনো একটি আঙ্গিকের নৈপুণ্য দেখেই মুগ্ধ হয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় বহুক্ষণ– এমনই ব্যাপ্তিময় ও বহুমাত্রিক জীবনযাপন করেছেন তিনি। ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এই মহৎ ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল কর্মময়। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে যেটুকু সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন, তার পুরোটাই তিনি বিকশিত করে গেছেন। প্রমাণ করে গেছেন, 'জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু কর্ম চিরন্তন'।

এ রকম একটি জীবনের জন্য মৃত্যুই শেষ কথা নয়। যে সম্ভাবনার বীজ তিনি বপন করে গেছেন, তা ডালপালা বিস্তৃত করে বেড়ে উঠছে এখনো। অসংখ্য তরুণের জন্য তাঁর জীবন অনিঃশেষ অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর প্রাণশক্তি আরও অজস্র মনে সঞ্চারিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নেবে সফলতার এক অনন্য শিখরে।

আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

লিখেছেন: সামান্থা খান ইরা
সহযোগিতায়: নিশাত তাসনিম জেসিকা

শুধু বৃহন্নলা নয় একটু মানুষ ভাবি

বর্ণ রায়

সৃষ্টিকর্তা আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন প্রধানত দুটি জাতি–পুরুষ ও নারী। কিন্তু রহস্যময়ভাবে আমাদের সঙ্গে আরেকটি দলকে এই ধরণিতে পাঠিয়েছেন, যাদের আমরা সাধারণত তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে চিনি। বিশুদ্ধ বাংলায় বলা হয় 'বৃহন্নলা'। নারী, পুরুষ বা এই বৃহন্নলা গোষ্ঠীর এই সুন্দর পৃথিবীতে আগমনের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ একই।

কিন্তু অদ্ভুত লাগে। আমরা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সবাই মানুষ। কিন্তু আমাদের জীবনযাপনের ধরন আলাদা। প্রত্যেক নারী-পুরুষ সমাজে বেড়ে উঠছে, লেখাপড়া শিখছে, চাকরি করছে। তারপর ঘর-সংসার, সন্তান প্রতিপালন– সবকিছুই যুগে যুগে একই চক্রে ঘটছে। কিন্তু আরেকটা অংশ 'বৃহন্নলা গোষ্ঠী'। তারা যেন ভিন্ন সমাজের লোক।

বৃহন্নলা বাংলাদেশের একটি বহুল আলোচিত সম্প্রদায়। যুগ যুগ ধরে তারা অবহেলিত। সমাজের সদস্যদের অন্ধকার ও রোগাক্রান্ত মানসিকতার কারণে এই সম্প্রদায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। জীবিকা অর্জনের জন্য তারা বাধ্য হয়ে যৌন ব্যবসা, ভিক্ষাবৃত্তি, চাঁদাবাজিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সবসময় তিরস্কার, উপহাস ও সামাজিক বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়। ফলে কখনো কখনো পথচারীদের অশীল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে হয়রানিও করে।

বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী, মানবদেহে মোট ৪৬টি বা ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। এগুলোর মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজোমকে অটোজোম বলে। আর বাকি এক জোড়া ক্রোমোজোমকে সেক্স ক্রোমোজোম বলে। এই সেক্স ক্রোমোজোম দুটি এক্স (X) এবং ওয়াই (Y) নামে পরিচিত। সন্তানের লৈঙ্গিক পরিচয় নির্ধারণে এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে নারীদের ডিপ্লয়েড কোষে দুটি সেক্স ক্রোমোজোমই X ক্রোমোজোম অর্থাৎ XX, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটি X, অপরটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ XY। কিন্তু মাঝেমধ্যে কোষ সঠিকভাবে বিভাজন না হওয়ায় সেক্স ক্রোমোজোম XX বা XY এর বদলে XXX বা XXY এই রকম অস্বাভাবিক কোষের সৃষ্টি হয়। ফলে বাচ্চা বৃহন্নলা হয়।

দেশে গত এক দশকের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ হাজার ৬২৯ জন। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ২২ শতাংশ, এক দশক আগে যা ছিল ১ দশমিক ৪৬ শতাংশ।

বৃহন্নলাদের সামাজিক বিকাশ খুবই ধীর। তারা এখনো সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞতার কারণে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। পরিবার থেকেও তাদের বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। লোকলজ্জার ভয়ে পরিবারও তাদের দায় মনে করে। তাই তারা একসময় পরিবার থেকে পালিয়ে যায় এবং নিজেদের মুক্ত মনে করে।

বৃহন্নলারা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটি পৃথক সমাজ খুঁজে বেড়ায়। একপর্যায়ে তাদের সমাজের তথাকথিত গুরুমায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেন। হাততালি দিয়ে, কোমর দুলিয়ে, ভারী মেকআপ লাগিয়ে নাচ-গানের অনুশীলন শুরু করে। এই বিষয়টিও যেন জনগণের কাছে লজ্জার।

যেদিন বাবা-মা জানতে পারেন, তাদের সন্তান বৃহন্নলা, তখন তাঁরা তাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেন। আত্মোৎসর্গের মতো পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের চিরন্তন মাধুর্য ছিঁড়ে পিতা-মাতারা লোকলজ্জায় সন্তানদের পৃথিবীর নিষ্ঠুর পথে নিক্ষেপ করেন।

বৃহন্নলা তো 'বিকলাঙ্গ' নয়, তারা 'বিশেষাঙ্গ'। তারা সৃষ্টিকর্তার এক অদ্ভুত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ।

বৃহন্নলা হলো একধরনের মিশ্র শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের নাম। যে সমাজ নিন্দা ও লজ্জাকে চিরস্থায়ী করে, তা পরিবর্তন করা না হলে একজন বৃহন্নলা ভয়, লজ্জা ও হীনম্মন্যতায় বেড়ে উঠবে। সে যখন ছেলে বা মেয়ে হিসেবে সমাজে মিথ্যা পরিচয় নিয়ে বড় হবে, তখন তার মনে কষ্ট, দুঃখ, বঞ্চনা জমা হবে। ফলে সে নিজেকে কিছুতেই এই সমাজের মূল ধারার অংশ মনে করবে না।

বাংলাদেশ সরকার বৃহন্নলাদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা এই সমাজে স্বাগত নয়। কাগজে-কলমে তাদের কিছু অধিকার আছে। কিন্তু বাস্তবে তারা স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অবহেলিত।

শুধু ভিক্ষা নয়, তাদের কাজে যোগ দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করা দরকার। তাদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বৃহন্নলাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ দিতে পারে। এসব নিয়োগ সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। ফলে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে। এভাবে একটা সার্বিক পরিবর্তন আসবে।

একটি লাইব্রেরি সোসাইটি গড়ে তোলা দরকার, যেখানে নারী বা পুরুষ কিংবা তৃতীয় লিঙ্গের কেউই লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার হবে না। যেখানে লৈঙ্গিক পরিচয়-নির্বিশেষে একজন ব্যক্তি সুযোগ এবং সম্মান পাবে।

বৃহন্নলা দুনিয়ায় সব সদস্যকেই বেশ কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। সন্ধ্যার পর বৃহন্নলা মহল্লার সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কোনো গুরুমা মাটিতে বসে থাকলে তার শিষ্যরা খাটে বা উঁচু কোনো জায়গায় বসে না।

বৃহন্নলারা মনে করে, তাদের গুরুমা দৈব ক্ষমতার অধিকারী। শিষ্যদের সম্পর্কে বৃহন্নলারা মনে করে, তাদের লেখা চিঠি যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা পাঠ বা স্পর্শ করে, তাহলে তাদের ভ্রূণের ক্ষতি হবে। তারা বিশ্বাস করে, তারা তাদের মৃত্যুর কথা আগেই জানতে পারে। সবকিছুই গুরুমা জানতে পারেন।

সারা পৃথিবীতে বৃহন্নলাদের প্রাপ্য অধিকার ও মানুষ হিসেবে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ আইন করা খুব জরুরি। সনাতন লৈঙ্গিক বলয়ও ভাঙা প্রয়োজন। ঘৃণা নয়, অবজ্ঞা নয়–শুধু মানুষ যেন পায় মানুষের সম্মান।

অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার মাঝেও অস্তিত্বের বৈধতার সংগ্রাম করে চলছে বৃহন্নলারা। হাজার হাজার শিখণ্ডী চোখের দ্যুতির মাঝে স্বপ্ন লালন করে চলছে সম্মান ও সমৃদ্ধিপূর্ণ এক জীবনের, এক ঘর-সংসারের।

ঠিক মাঝের দাগ বরাবর ছবিটির ডান আর বাম পাশ আলাদাভাবে দেখলে এক পাশে নারী আর অন্যপাশে নরের অবয়ব চোখে পড়বে। একসঙ্গে পুরোটা ছবি দেখলে মনে হবে যেন এক মিশ্র প্রকাশ। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সামাজিক অস্তিত্বও যেন এমনই এক মিশ্র পরিচয়ের ঘেরাটোপে বন্দি।

যুদ্ধ-পরবর্তী
এক বুদ্ধিজীবী পরিবারের গল্প

মোছা. সাদিকা রহমান

১৯৭১ সাল, আমাদের স্মৃতির পাতায় যেন এক কালো দাগ কেটে রেখে দিয়েছে। যখনই সালটির কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে হাজারো মানুষের অশ্রুসিক্ত হওয়ার কথা, মনে পড়ে সেই রক্তে ভেসে যাওয়ার রাস্তার কথা এবং লক্ষ লক্ষ বাঙালির জীবন দানের কথা। যারা ওই যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে আমাদের এনে দিয়েছে মহান স্বাধীনতা, তাদের কথা আমরা কখনোই ভুলতে পারব না। কিন্তু এই মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের কী হয়েছে, তা আমরা কজনই-বা জানি। তাদের যে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা কতটুকুই-বা জানি। আজ সে রকম একটি পরিবারের কথাই জানব, যাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে। এমন এক নারীর কথা শুনব, যার অপেক্ষা কখনোই শেষ হয়নি।

দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ২ জুন। অধ্যাপক আব্দুর রহমান বর্তমানে নাগেশ্বরী উপজেলার বাড়ি থেকে রংপুর কারমাইকেল কলেজের উদ্দেশে রওনা দেন। তিনি ওই সময় কারমাইকেল কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। কলেজে কিছু কাজ পড়ে যাওয়ায় তাঁকে ওই সময় রংপুরে যেতে হয়। কিন্তু এই যাওয়াই যে তাঁর শেষ যাওয়া, তা কেউ জানত না। তাঁর স্ত্রী এবং তিন সন্তানও জানতেন না তাঁরা আর কখনো তাঁকে দেখতে পাবেন না। হয়তো রংপুরের কোনো এক বধ্যভূমিতে আজও পড়ে আছে তাঁর কঙ্কাল। কেই-বা জানে সেই খবর। সেই কথা তাঁর স্ত্রীও জানতেন না। তাই সারা জীবন ভেবে গেছেন, হয়তো একদিন আব্দুর রহমান ফিরে আসবেন।

আব্দুর রহমান চলে যাওয়ার পর তিন সন্তানকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন তাঁর স্ত্রী সাজেদা খাতুন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হয় এবং ১৯ বছর বয়সে তাঁকে বিধবা হতে হয়। আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর জীবনের ওপর নেমে আসে একা গভীর অন্ধকারের ছায়া। না শ্বশুরবাড়ি, না বাবার বাড়ি– কোথাও যেন টিকতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু হার মেনে নিতে নারাজ এই সাহসী নারী। ওই সময় তিন সন্তান নিয়েই তিনি দশম শ্রেণিতে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছিলেন। এরপর তিনি শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত করেন এবং সৃষ্টিকর্তার অসীম দয়ায় তাঁকে প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই যুদ্ধে তাঁর বড় ভাই ও শ্বশুর–দুজনেই সব সময় পাশে ছিলেন।

১৯৭৪ সাল আসতে আসতে আমাদের দেশের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওই বুদ্ধিজীবী পরিবারের যুদ্ধ শেষ হয়নি। বড় মেয়ে কখনো শখ করে চুড়ি কিনতে চাইলে তা কিনে দেওয়া যায়নি। ছোট ছেলে গুঁড়া দুধ খাবে বলে আবদার করত কিন্তু সেই দুধের অনেক দাম, কেমন করে সেই আবদার পূরণ করবেন তিনি। এই আবদার পূরণ করলে যে রাতে কারও কপালে ভাত জুটবে না। এই কথা ভেবে তিনি সন্তানকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে যেতেন। কারণ, রাতে তাঁরই অসহায় এবং কোমল চেহারা কেউ দেখতে পাবে না। লোকে এই চেহারা দেখলে যে অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে আসবে। এই অর্থসংকটে যুদ্ধের মাঝে আরেক যুদ্ধ করতে হয় তাঁকে। এই যুদ্ধের নাম 'লোকের কথার যুদ্ধ'। 'মাত্র ছয় বছর সংসারজীবনে স্বামী মারা গেছেন, এই মেয়ে অবশ্যই অলক্ষ্মী', 'একটা মেয়েমানুষ হয়ে কেমন করে এই তিন সন্তানকে মানুষ করতে পারে?' এ রকম হাজারো কথা তাঁকে প্রতিনিয়ত শুনতে হয়েছে। তারপরও হার মানেননি তিনি। ভেবেছেন সন্তানদের মানুষ করবেন, যাতে সবার কথা একদিন বন্ধ হয়ে যায়।

এমনকি তাঁর সন্তানদের জন্য এ যাত্রা সহজ ছিল না। তাদেরকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য। বাবা না থাকার যে যন্ত্রণা, তা শুধু ভুক্তভোগীরাই বলতে পারে। আব্দুর রহমানের মৃত্যুর সময় তাঁর ছোট ছেলের বয়স ছিল মাত্র ৮ মাস, তাই সে জানেও না, তার বাবা কেমন দেখতে ছিল। এমনকি তাঁর অন্য দুই সন্তানেরও মনে নেই তাদের বাবা কেমন ছিলেন। বড় ছেলে মো. সাদিকুর রহমান বলেন, তাঁদের কাছে তাঁর মা-ই ছিলেন বাবা-মা। সন্তানদের জীবন আলোকিত করে তুলেছিলেন তাঁদের মা।

আজ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমরা কজনই-বা জানি এই মুক্তিযোদ্ধা এবং বুদ্ধিজীবী পরিবারের কথা। আমরা শ্রদ্ধা ও সম্মান করি এই মুক্তিযোদ্ধা এবং বুদ্ধিজীবীদের। কিন্তু তাঁদের পরিবারের কী খবর, তা আমরা কি জানি? আমাদের উচিত তাঁদেরকেও সম্মান করা, যাঁরা স্বাধীনতার পরেও জীবনযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। আজ শুধু একটি পরিবারের কথাই জানলাম, কিন্তু এমন হাজারো পরিবারের কথা জানার বাকি আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পেছনে তাদেরও বড় অবদান রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের উত্তাল সময়
ছবি: প্রয়াত আলোকচিত্রী আনোয়ার হোসেন

বাবার স্মৃতি

আনিকা মেহজাবীন

দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া গানের মতো যদি বলি– আমার সেই সোনালি ছেলেবেলা কোথায় হারাল। আমার কৈশোরের সুন্দর স্মৃতির বড় অংশজুড়েই 'বাবা'। একজন ষাটোর্ধ্ব সাদামাটা ভদ্রলোক, যার ব্যক্তিত্ব আমাকে অনুপ্রেরণা জোগাত প্রতিটি বিষয়ে। মনে পড়ে, সারা দিন বিরতিহীনভাবে ক্লাস, প্রাইভেট পড়ে বাসায় ফিরতাম। তখন বাবা বলতেন, আহা রে, আমার মেয়েটা! বাবার মতো অত সুন্দর করে কেউ মা ডাকে না আমায়। ভারি মিষ্টি শোনাত সেই ডাক।

মানুষটার কাছে আমি আবদার করেছি, অথচ পূর্ণতা পায়নি, এমনটা কখনো হয়নি। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, বাবার অফিস শেষে আর ক্লাস ছুটির পর আমরা বেরিয়ে পড়তাম ঘুরতে। কোথায় যাব জানা নেই। কিন্তু আমার মন রক্ষায় বাবা বেরিয়েছেন। ঢাকার আশপাশে ঘুরে বাসায় ফিরতাম। মনে হতো, আমার কোনো দুঃখ নেই। এই তো আছি বেশ পড়াশোনা আর বাকি সময় পরিবার নিয়ে। সময় পেলে বাবার কাছ থেকে ইতিহাস শুনতাম। মনে হতো, এই মানুষটা জ্ঞান রাখে না এমন কোনো বিষয় বোধ হয় পৃথিবীতে নেই! তিনি অসীম জ্ঞানের আধার! যখনই কোনো বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতাম, জানতাম-আমার বাবা আছেন।

২৬ জুলাই ২০২১, বাবাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জানানো হলো, বাবার করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। দিন চারেক আগে থেকেই বাবার জ্বর জ্বর ভাব ছিল।

ওই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সৃষ্টিকর্তা কী নিষ্ঠুর! শেষমেশ আমার বাবারই এই মরণব্যাধি রোগ হলো! যেহেতু বাবা প্রাথমিক অবস্থায় ভালোই ছিল, তাই আমরাও মনে মনে ভরসা পাচ্ছিলাম। মনকে সান্ত্বনা দিতে থাকলাম, বাবা সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস বোঝা বড় দায়। আমার এখনো মনে পড়ে, প্রতিনিয়ত ভাবতাম, এই তো কালই বুঝি ভোর হবে, ভোরের আলোয় ঘুচে যাবে সকল অন্ধকার। মুছে যাবে মানসিক যন্ত্রণা, মুক্তি হবে সবার।

আসলেই মুক্তি হলো বটে! প্রায় এক মাসের লড়াই শেষ হলো। বাবা শূন্যে উড়াল দিলেন।

নিজ দেশে গেল পাখি ফুরিলে মেয়াদ,
পিঞ্জিরা রহিলো খালি হইয়া বরবাদ।

বুঝলাম, বুকের ছোট্ট জমিনে ঠাঁই দেওয়ার আর কেউ রইল না। চোখের সামনে বাবার শেষ যাত্রা দেখলাম। কাউকে বোঝাতে পারিনি, কী অসহ্য যন্ত্রণা আমি ওই দিন অনুভব করেছিলাম!

বাবা চলে যাওয়ার পরই বুঝতে পারলাম, পৃথিবীটা ভীষণ কঠিন। গত একটা বছরে মনে হয় না আনন্দ আমাকে কোনোভাবে স্পর্শ করেছে।

বাবা থাকতে আমরা ঝুম বৃষ্টিতেও ঘুরতে বের হতাম। গাড়ির কাচে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ত। তা দেখতে আমার অসম্ভব সুন্দর লাগত। মনে হতো পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্যের মধ্যে একটি। এ বছরও বর্ষা এলো, কিন্তু মনে হচ্ছে, এ যেন ছন্দহীন বর্ষা, সুরহীন বর্ষা।

এ বছর বর্ষায় কোনো উৎসব নেই।

পরিবারে সবাই লুকোচুরি খেলতে শিখেছে এখন। কান্না লুকানোর প্রতিযোগিতাও চলে, যেন চোখের জল আড়াল করার খেলা।

এখনো মনে পড়ে, সেবার মা আর বাবা মিলে আমরা গিয়েছিলাম নিকলি হাওরে। তারপর গেলাম সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদের বাড়ি দেখতে। ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। পুরো হাওরে আমরা তিনজন আর ট্রলারের চালক। কিন্তু আমার একটুও ভয় হচ্ছিল না। কারণ, বাবার রাজ্যে আমি ভয়ডরহীন রাজকন্যা। সেই উন্মুক্ত ট্রলারে বসে আমি পুরোটা সময় আকাশে চাঁদ দেখতে দেখতে এসেছি। কী সুন্দর আর মনোরম সেই দৃশ্য! আর কি হবে সেই দর্শন! হয়তো হবে, শুধু থাকবে না বাবার ছায়া।

বাবার সঙ্গে অনেক দর্শনীয় স্থান ঘুরেছি। যতটুকু ঘুরেছি, তার চেয়ে বেশি শিখেছি। এত সুন্দর করে হাতে ধরে সবকিছু শেখাতেন। কোনো বিরক্তি নেই। সবসময় কর্মতৎপর। মনে হতো, তিনি আমাদের চেয়ে বেশি প্রফুল্ল। সবসময় একটা প্রাণবন্ত পরিবেশ। কাজের চাপ নিয়ে কখনোই কোনো অভিযোগ তাঁর কাছ থেকে শুনিনি।

বাবা চলে যাওয়ার পর এমন সময় আর আসেনি। ভবিষ্যতের কথা আমরা জানি না; তবে অনুভব করি, সেই সোনালি দিনগুলো আর হয়তো ফিরে আসবে না। তবু জীবন চলে জীবনের নিয়মে। কারও জন্যই তা থেমে থাকে না। আমাদেরও থাকেনি। সব স্মৃতি বুকের ভেতর বাক্সবন্দি করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছি।

ছবি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তুলির আঁচড়ে পিতা-কন্যার মধুর মুহূর্ত

ট্র্যাশন শো-এর এবারের আয়োজনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার হুমায়রা খান (বামে) ও বিবি রাসেল (ডানে)

ফ্যাশন-ট্র্যাশন ট্র্যাশন-ফ্যাশন

ফ্যাশন মূলত ট্র্যাশনই

নিশাত তাসনিম জেসিকা
আকাশ কর্মকার

প্রকৃতি এখন আমাদের ওপর যেন বড্ডই অপ্রসন্ন হয়ে আছে। কখন যে কোন রূপ ধারণ করে, বোঝা বড়ই দায়! প্রকৃতির প্রসন্নতার পরশ পাওয়া এখন অমৃতের খোঁজ পাওয়ার মতোই কঠিন। এ রকম তো অবশ্য হবারই কথা! প্রতিদিন নানান উপায়ে, নানান ছলে, কারণে-অকারণে কারও বুকে অবিরত আঁচড় কাটতে থাকলে কেউ তো আর প্রসন্ন থাকতে পারে না! এখানে প্রশ্ন এসে যায়– এর দায়টা আসলে কার? তবে সুখের বিষয় হলো, আমরা মানুষেরা একটু একটু করে সেই দায়টা নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করছি। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) 'ট্র্যাশন শো'র আয়োজন বলা যেতে পারে তারই একটা অংশ। প্রকৃতিকে বাঁচাতে নিজেদের সচেতন করা। যেন এক ঢিলে দুটি পাখি মারা– একদিকে কোর্সের উদ্দেশ্য পূরণ, আর অন্যদিকে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে নিজেদের বাঁচানোর ক্ষুদ্রতম প্রয়াস।

মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের কনভারজেন্স কমিউনিকেশন-১ কোর্সের শিক্ষার্থীদের এ প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিতে ভিন্নধর্মী আয়োজন এই ফ্যাশন শো। এতে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুজন ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল এবং হুমায়রা খান।

১৭ আগস্ট ২০২৩-এর আয়োজনে কোর্সের শিক্ষার্থীরা ছয়টি দলে ভাগ হয়ে এ শোতে অংশ নেয়। প্রতিটি দল ফেলে দেওয়া বিভিন্ন বস্তু, যেমন পুরোনো বস্ত্র, ব্যবহার্য প্লাস্টিক ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের নকশায় ও হাতে তৈরি পোশাক পরিধান করে ভিন্নধর্মী এই ফ্যাশন শোতে অংশগ্রহণ করে, যাকে তারা ট্র্যাশন শো নামে অভিহিত করেছে। দলগুলো আলাদা অথচ নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে উপলক্ষ করে তাদের উপস্থাপনায় প্রকৃতিদূষণ এবং বস্তুর পুনর্ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে।

যেমন ধরুন 'সি স্কোয়াড' দলটির কথা। এই দল সমুদ্রদূষণ এবং কাঠামোগত দুর্নীতির মাঝে একটি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। 'ট্র্যাশ ইনটু ট্রেজার' দলটি ফাস্ট ফ্যাশন দুনিয়ার কালো বা অপচয়ের দিকটি উপস্থাপন করে। মূলত এ ধরনের ফ্যাশন মানসিকতার জন্য মানুষ অতিরিক্ত বস্তু বা বস্ত্র ব্যবহার করছে। এটিকে অন্যভাবে দেখলে বলা যায়, অতিরিক্ত মাত্রায় বস্তুর অপচয় করছে; যা আসলে প্রকৃতির গায়ে ধীরে ধীরে ক্ষতচিহ্ন এঁকে চলেছে। একটি পোশাক বা বস্তু একবার ব্যবহারের পর আর ব্যবহার না করায় আরেকটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। ফলে নতুন আরেকটির আবির্ভাব ঘটছে প্রতিনিয়ত। এর ফলে অব্যবহৃত বস্তুগুলো জমা হতে হতে স্তূপে পরিণত হচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিকেই দূষণ করে চলেছে। কখনো কি এভাবে বিষয়টি আমাদের ভেবে দেখা হয়েছে? প্রতিটি দল তাদের উপস্থাপনায় আমাদের এসব ভুল শনাক্ত করে তা শোধরানোর একটা সুযোগ করে দিয়েছে; যেন বলছে, কেন সব (ট্র্যাশ) ফেলে দিচ্ছ, তা-ও আবার এখানে-সেখানে? আরও একবার ব্যবহার করো; তাহলে প্রকৃতি যেমন বাঁচবে, তেমনি তুমিও বাঁচবে। আর এর ফলে যা ঘটবে, ফ্যাশন শুধু ট্র্যাশন হবে।

উল্লেখ্য, এ 'ট্র্যাশন শো'র কিউরেশনে ছিলেন কনভারজেন্স কমিউনিকেশন-১ কোর্সের শিক্ষক এফ এম মনিরুজ্জামান শিপু এবং তাঁকে সহায়তা করেন রাইফা মৌনতা, আফিয়া ইবনাত ইসুফ জাই বহ্নিসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী।

ফ্যাশন শোতে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের একাংশ

প্রবাল দ্বীপের

স্মৃতি রোমন্থন

আশরিকা জাহান

দিনটি ছিল ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর। লকডাউনে দীর্ঘ সময় ঘরে বন্দি থাকার পর খুব করে ইচ্ছে হয়েছিল সমুদ্রস্নানের। তার ওপর সময়টিও ছিল খুব উপযুক্ত। সাগরপাড়ে দাঁড়িয়ে নতুন বছরের প্রথম সূর্যোদয় দেখার সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করতে চাইনি। তাই আগে-পরে কিছু না ভেবেই বেরিয়ে পড়েছিলাম সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশে।

২৯ তারিখ রাতে আমি আর আমার বন্ধু মিলে ঢাকা থেকে টেকনাফের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। গাড়িতে বসেই দুই বন্ধু ঘুমের রাজ্যে চলে গেলাম। পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, চোখ মেলে তাকাতেই দেখি আমরা টেকনাফ পৌঁছে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে লক্ষ করলাম, পাশেই একটি ছোট্ট দোকানে বিক্রি হচ্ছে গরম-গরম ডিম ভাজি আর পরোটা। ক্ষুধার তীব্রতা এতই বেশি ছিল যে তেলে ভাজা খাবার অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও সেদিন তিনটি পরোটা খেয়েছিলাম। নাশতা শেষ করেই চলে গেলাম জাহাজের টিকিট নিতে। শত পর্যটকের ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে বেশি টাকা খরচ করে দুটো টিকিট পেয়েছিলাম। জাহাজে যখন উঠলাম, তখন ঘড়ির কাঁটায় সকাল ঠিক ৮টা। কিছুক্ষণ পরেই জাহাজ ছুটল সেই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে।

এরপর যা ঘটেছিল, তা আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করে। জাহাজ কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখলাম, হুট করে একঝাঁক গাঙচিল এসে ভিড় জমাল। মনে হচ্ছিল যেন তারাও জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে–কে কার আগে পৌঁছাবে। প্যাকেট খুলে হাতের ওপর কিছু চিপস নিয়ে হাত বাড়ানোমাত্রই পাখিগুলো তা মুখে নিয়ে নিচ্ছিল।যদিও গাঙচিল কিংবা অন্য যেকোনো বন্য প্রাণীকে খাবার দেওয়া উচিত নয়। এসব প্রক্রিয়াজাত খাবারে প্রাণীদের অভ্যস্ত করা হলে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে তাদের জীবন ধারণের জন্য; বিশেষ করে গাঙচিলদের ক্ষেত্রে চিপসজাতীয় খাবার ডিম পাড়তে বাধাগ্রস্ত করে। এ ছাড়া তাদের মাছ শিকারে দক্ষতা কমিয়ে দেয়।। সবকিছু স্বপ্নের মতো লাগছিল। ইট-পাথরের চার দেয়ালের মাঝে কখনো বুঝতেই পারিনি প্রকৃতি এত মায়াবী আর ঐশ্বরিক হয়। নিমেষেই যেন সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। যত দূর চোখ যায় চারদিকে শুধু পানি আর পানি। ২ ঘণ্টা পর দেখতে পেলাম, অদূরে একটি ছোট্ট দ্বীপ। মনে হলো যেন পৃথিবীর বুকে এক টুকরো স্বর্গ।

সকাল সাড়ে দশটার দিকে জাহাজ থেকে নেমে অবশেষে পা রাখলাম সেই স্বপ্নের দ্বীপে। টিভির পর্দা ছাড়া এত কাছ থেকে সমুদ্র দেখার পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। সোনালি রোদের চকচকে প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম নীল দরিয়ার বুকে। দিগন্তের নীলিমা যেন ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে আমার অস্তিত্বও। কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না বলে সেদিন থাকার জন্য আমরা কোনো হোটেল পাইনি। তবে তাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। সৈকতে বসেই কাটিয়ে দিয়েছিলাম পুরোটা দিন। ধীরে ধীরে সূর্যটাও যেন মিলিয়ে গেল সাগরের বুকে। ভাগ্যক্রমে সেদিন রাতে আমাদের থাকায় জায়গা হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের সমুদ্রবিলাসে। এরই মাঝে হঠাৎ করে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। ধীরে ধীরে লাল আভা কালো রঙে পরিণত হয়ে গেল। মাছ ধরার ট্রলারগুলোকে ফিরে আসার জরুরি বার্তা দেওয়া হচ্ছিল। দমকা বাতাস যেন সবকিছু উড়িয়ে নেওয়ার অবস্থা। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সব কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল। ঝড়-বৃষ্টি না এলেও সেদিন রাতে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। আমার তো বেশ ভালোই লাগছিল। মোমবাতির আলোয় সেরে ফেললাম রাতের ভোজন। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, করলা ভাজি আর সামুদ্রিক কোরাল মাছ। বেশ থমথমে একটা পরিবেশের মধ্য দিয়েই রাত কেটে গেল।

পরদিন সকালে নাশতা করে বেরিয়ে পড়লাম ছেঁড়াদ্বীপ ঘুরে দেখতে। দুই বন্ধু দুটো সাইকেল ভাড়া করলাম, ১০০ টাকা প্রতি ঘণ্টা। ২০-২৫ মিনিট লেগেছিল প্রায় পুরো দ্বীপ ঘুরতে। হাজারো নারকেল গাছের সমাহার, সঙ্গে কত রঙবেরঙের প্রবাল। কড়া রোদে বালুর মধ্য দিয়ে সাইকেল চালিয়ে বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু নারকেল জিঞ্জিরার নারকেল পানি খেয়ে মুহূর্তেই সব ক্লান্তি যেন উধাও হয়ে গেল। শহরের বিক্রি হওয়া নারকেলের চেয়ে এখানকার নারকেলের আকার এবং স্বাদে মনে হলো অনেক পার্থক্য। এরপর নেমে পড়লাম সমুদ্রস্নানে। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল আমাদের ওপর। সাঁতার জানি না ভেবে একটু ভীতি কাজ করলেও উপভোগের উত্তেজনাই বেশি ছিল। এভাবেই কেটে গেল দ্বিতীয় দিন। সৌভাগ্যবশত সেদিন আর ঝড়বৃষ্টির লক্ষণ দেখা যায়নি। রাতে ছিল বারবিকিউ পার্টি। মসলাদার রূপচাঁদা মাছ আগুনে ঝলসিয়ে সঙ্গে কোকা-কোলার সমাহার বেশ রোমাঞ্চকর করে তুলেছিল। অদূরেই শোনা যাচ্ছিল জেলেদের গান। টিমটিম আলোয় নৌকাতে বসে তারাও খুব উপভোগ করছিল।

রাত পেরিয়ে ধীরে ধীরে আলোর আভা দেখা দিতে লাগল। উদয় হলো নতুন বছরের নতুন সূর্য। তীরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সাগরের গর্ভ থেকে জন্ম নিল এক নতুন সকাল! অবচেতন মনে অনেক কিছু উপলব্ধি করেছিলাম সেদিন। নিজের অজান্তেই চোখ ছলছল করে উঠেছিল, খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলাম। মুহূর্তেই যেন সমুদ্রের বিশালতা আমাকে তার উদারতার পরিচয় দিয়ে গেল। শিখিয়ে দিয়ে গেল কীভাবে এই বিশালতার উপমা নিজের ভেতর ধারণ করতে হয়। হারিয়ে গিয়েছিলাম সেই গভীরতার মাঝে। সেই দুটি দিনে আমি প্রকৃতির যেমন রুদ্র মূর্তি দেখেছি, তেমনি উপভোগ করেছি তার বিনম্রতা। শান্ত, শীতল বাতাস আর ঢেউয়ের সঙ্গে যেন তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল।

পেছন থেকে হঠাৎ কানে আওয়াজ এলো, সময় হয়ে গেছে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়ার। চোখের পলকে কীভাবে দুই দিন কাটিয়ে দিলাম বুঝতেও পারিনি। ফিরে এলাম আবার সেই ব্যস্ত আর যান্ত্রিক শহরে। তবে স্মৃতিগুলোকে আজও বন্দি করে রেখেছি মনের চিলেকোঠায়। প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সাগরপাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার যে অসাধারণ মুহূর্ত প্রকৃতি আমাকে উপহার দিয়েছিল, সেই অনুভূতি এখনো স্মৃতি রোমন্থন করার মতো।

ছবি: প্রবালদ্বীপের চারপাশে নীলজলের সাগরে পা ডুবিয়ে সূর্যোদয় কিংবা দিনান্তের সূর্যাস্তের রূপদর্শনে যে অনাবিল প্রশান্তি, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর